‘আর রিসালাতুত তাবূকিয়্যাহ’ গ্রন্থের অনুবাদ

মুসাফিরের পাথেয়

মূল

ইমাম ইবনুল কাইয়িম ﵀

অনুবাদ

আবদুল্লাহ আল নোমান

সম্পাদনা

মুফতি আবদুল্লাহ জোবায়ের

জাকারিয়া মাসুদ

دار الفلاح

দারুল ফালাহ

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা ও স্তুতি একমাত্র আল্লাহর জন্য। এর উপযুক্ত কেবল তিনিই। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক তাঁর সর্বশেষ নবি ও রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ-এর ওপর। আল্লাহ তাআলা তাঁর কিতাবে ইরশাদ করছেন,

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢

> ‘নেক কাজ ও তাকওয়ার কাজে তোমরা একে অপরকে সহযোগিতা করো। পাপাচার ও সীমালঙ্ঘনের কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা কোরো না। আর তাকওয়া অবলম্বন করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ শাস্তি প্রদানে অত্যন্ত কঠোর।’[১]

আল্লাহর বান্দা হিসেবে প্রত্যেকের জীবনে দুটি বিষয় থাকে।

প্রথমত, নিজেদের মধ্যকার সম্পর্ক এবং এই সংশ্লিষ্ট দায়িত্ব।

দ্বিতীয়ত, নিজেদের ও আল্লাহর মধ্যকার সম্পর্ক এবং এই বিষয়ক কর্তব্য।

মানুষের আচার-আচরণ হয় নিজেদের মাঝে, অথবা প্রতিপালক আল্লাহ তাআলার সাথে। বান্দা এই দুই অবস্থার কোনো একটার সাথেই সব সময় জড়িত থাকে। সুতরাং সৃষ্টির সাথে বান্দার ওঠাবসা, সহযোগিতা এবং সাহচর্যগ্রহণের ভিত্তি যেন হয় আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি এবং তাঁর আনুগত্য। এটাই বান্দার সফলতা এবং সৌভাগ্যের চাবিকাঠি। এই নেক কাজ ও তাকওয়াই সম্পূর্ণ দ্বীনের সমষ্টি। এ দুটি নামই একটি অপরটির বদলায় ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এ ব্যবহৃত হওয়াটা হয়তো অন্তর্ভুক্ত হিসেবে, নয়তো আবশ্যিকভাবে। তবে অন্তর্ভুক্ত হওয়াটাই বেশি প্রাসঙ্গিক। কারণ নেক কাজ যেমন তাকওয়ার অংশ, তেমনি তাকওয়াও নেক কাজের অংশ। সে হিসেবে এটা বলা যায়, আলাদাভাবে ব্যবহৃত হওয়ার সময়ও একটির মধ্যে অপরটির অস্তিত্ব থাকে। এর উদাহরণ হলো ঈমান ও নেক কাজ,

[১] সূরা মায়িদাহ, ৫ : ২

দরিদ্রতা ও রিক্ততা, পাপাচার ও অবাধ্যতা, খারাপ কাজ ও অশ্লীলতা ইত্যাদি। এখানে উল্লেখকৃত প্রতিটি জোড়বদ্ধ শব্দ একটি অপরটির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।

এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি, যা স্মরণ রাখলে মনের মধ্যে আসা অনেক সংশয় নিরসন হবে। আমরা এখন নেক কাজ ও তাকওয়ার অন্য কোনো উদাহরণ নিয়ে আলোচনা করব।

মূলত 'بِرٌّ' শব্দের অর্থ হলো কোনো বস্তুর কাঙ্ক্ষিত পূর্ণতা এবং কল্যাণময় উপকার। শব্দের গঠনপ্রণালী থেকে এমনটাই বুঝে আসে। আরবিতে গমকে বলা হয় 'بُرٌّ' যা একই শব্দমূল থেকে গঠিত। অন্যান্য শস্যের তুলনায় গমের উপকারিতা ও কল্যাণের আধিক্যের কারণে, এ শব্দমূল থেকে গঠন করা হয়েছে। একই শব্দমূল থেকেই গঠিত হয়েছে رَجُلٌ بَارٌّ(সৎ ব্যক্তি), بَرٌّ (মহৎ), كِرَامٌ بَرَرَةٌ (পূতপবিত্র ফেরেশতা) এবং اَلْأَبْرَارُ (নেককারগণ) প্রভৃতি। অতএব, 'بِرٌّ' তথা নেক কাজ হচ্ছে এমন শব্দ, যা বান্দার কাঙ্ক্ষিত সব কল্যাণ ও পূর্ণতার সমষ্টি। এর বিপরীতে 'إِثْمٌ' তথা 'পাপাচার' ব্যবহৃত হয় সব ধরনের মন্দ গুণ ও দোষত্রুটির সমষ্টি বোঝার জন্য। ওয়াবিসাহ ইবনু মা'বাদ ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কাছে এলাম। তখন তিনি বললেন,

جِئْتَ تَسْأَلُ عَنِ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ

"তুমি পুণ্য এবং পাপের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করতে এসেছ?"

আমি বললাম, "যে সত্তা আপনাকে সত্য দিয়ে পাঠিয়েছেন, (তাঁর কসম!) এটা ছাড়া অন্য কিছু জিজ্ঞেস করতে আসিনি।" তিনি বললেন,

الْبِرُّ مَا انْشَرَحَ لَهُ صَدْرُكَ، وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ، وَإِنْ أَفْتَاكَ عَنْهُ النَّاسُ

"নেকি সেটাই, যার প্রতি তোমার অন্তর পরিতৃপ্ত হয়। আর পাপ সেটা, যা তোমার মনে খটকা সৃষ্টি করে; যদিও লোকেরা তোমাকে (তার বৈধতার ব্যাপারে) ফতোয়া দিয়ে থাকে।"'[২]

নাওয়াস ইবনু সামআন ﵁ থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ বলেছেন,

الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ، وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ، وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ

[২] মুসনাদু আহমাদ, হাদীস নং : ১৭৯৯৯

‘নেক কাজ হলো সচ্চরিত্রের নাম। আর পাপ তা-ই, যা তোমার অন্তরে সন্দেহ সৃষ্টি করে। এবং তা লোকে জেনে ফেলুক—এ কথা তুমি অপছন্দ করো।’[৩]

মোটকথা, পাপ হলো এমন শব্দ, যা সব ধরনের মন্দ কাজ এবং নিন্দনীয় চরিত্র বুঝিয়ে থাকে।

সে হিসেবে ঈমানের প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সকল শাখা নেক কাজের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক আমলের সাথে জড়িত সবকিছুই নেক কাজের অন্তর্ভুক্ত। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে নেক কাজ বলতে অন্তরের সততা বোঝায়। ঈমানের স্বাদ লাভ করা, যাবতীয় আত্মিক ব্যাধি থেকে নিরাপদ থাকা, প্রফুল্লতা অনুভব করা, ঈমানী শক্তিতে বলীয়ান হওয়া, ঈমানী সজীবতা অনুধাবন করা ইত্যাদি। ঈমানের এক ধরনের মিষ্টতা রয়েছে। যার অন্তর সেটা অনুভব করতে পারে না, সে হয়তো বেঈমান নয়তো তার ঈমান কমজোর। সে ওই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত, যাদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন,

قَالَتِ ٱلۡأَعۡرَابُ ءَامَنَّاۖ قُل لَّمۡ تُؤۡمِنُواْ وَلَٰكِن قُولُوٓاْ أَسۡلَمۡنَا وَلَمَّا يَدۡخُلِ ٱلۡإِيمَٰنُ فِي قُلُوبِكُمۡۖ

‘বেদুঈনরা বলল, “আমরা ঈমান আনলাম।” বলো, “তোমরা ঈমান আনোনি।” বরং তোমরা বলো, “আমরা আত্মসমর্পণ করলাম।” আর এখন পর্যন্ত তোমাদের অন্তরে ঈমান প্রবেশ করেনি।”’[৪]

বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী ওইসব লোকেরা নিফাকমুক্ত মুসলিম, তবে মুমিন নয়। তাদের অন্তরে ঈমান প্রবেশ করেনি যে, তারা এর হাকীকতের সংস্পর্শে আসতে পারবে কিংবা এর স্বাদ অনুভব করবে। আল্লাহ তাআলা নেক কাজের বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নোক্ত আয়াতে একত্রিত করেছেন,

لَّيۡسَ ٱلۡبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمۡ قِبَلَ ٱلۡمَشۡرِقِ وَٱلۡمَغۡرِبِ وَلَٰكِنَّ ٱلۡبِرَّ مَنۡ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَٱلۡمَلَٰٓئِكَةِ وَٱلۡكِتَٰبِ وَٱلنَّبِيِّـۧنَ وَءَاتَى ٱلۡمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ ذَوِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينَ وَٱبۡنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآئِلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ وَٱلۡمُوفُونَ بِعَهۡدِهِمۡ إِذَا عَٰهَدُواْۖ وَٱلصَّٰبِرِينَ فِي ٱلۡبَأۡسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلۡبَأۡسِۗ

[৩] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ২৫৫৩

[৪] সূরা হুজুরাত, ৪৯ : ১৪

أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا۟ ۖ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

‘নেক কাজ শুধু এই নয় যে, পূর্ব কিংবা পশ্চিমদিকে মুখ ফেরাবে, বরং বড় নেক কাজ হলো ঈমান আনবে আল্লাহর ওপর, কিয়ামাত দিবসের ওপর, ফেরেশতাদের ওপর এবং নবিগণের ওপর, আর তাঁরই মহব্বতে সম্পদ ব্যয় করবে আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতিম-মিসকিন, মুসাফির-ভিক্ষুক ও মুক্তিকামী ক্রীতদাসদের জন্যে। আর যারা সালাত প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত দেয় এবং ওয়াদা করলে ওয়াদা রক্ষা করে এবং অভাবে, রোগে-শোকে ও যুদ্ধের সময় ধৈর্যধারণকারী, তারাই সত্যবাদী, আর তারাই মুত্তাকি।’’[৫]

আল্লাহ তাআলা এখানে নেক কাজের সংজ্ঞায় ঈমানের বিষয় এবং আমলগত বিষয়ও উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ, ফেরেশতা, কিতাব, নবি-রাসূল এবং আখিরাতের প্রতি ঈমানের আনার কথা প্রথম অংশে বলা হয়েছে। এ বিষয়গুলোই ঈমানের পাঁচ মূলনীতি; যার ওপরে ঈমান দাঁড়িয়ে আছে। এরপর এসেছে বাহ্যিক আমলগত বিষয়গুলো। সালাত, যাকাত এবং আবশ্যক খরচাদি ইত্যাদি বাহ্যিক আমলও এর মধ্যে শামিল। পাশাপাশি সবর, ওয়াদা পালনের মতো অন্তরের আমলও রয়েছে। সুতরাং এই বৈশিষ্ট্যগুলো দ্বীনের বাহ্যিক বিধিবিধান, অন্তরের বিষয়াদি সকল প্রকারকেই অন্তর্ভুক্ত করেছে। এরপর আল্লাহ তাআলা জানিয়ে দিচ্ছেন যে, তাকওয়ার বৈশিষ্ট্যও এগুলো। অর্থাৎ এখানেও তাকওয়া আর নেক কাজ সমার্থক হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। আল্লাহ বলছেন,

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

‘তারাই সত্যাশ্রয়ী, আর তারাই তাকওয়াবান।’

[৫] বাকারাহ, ২ : ১৭৭

তাকওয়ার পরিচয়

ঈমানের সাথে ও আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে প্রতিদানের আশায় করণীয় ও বর্জনীয় বিষয়ে তাঁর আনুগত্য করা। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার আদেশের ওপর ঈমান রেখে, আল্লাহর ওয়াদার প্রতি আস্থা রেখে, তাঁর বিধিবিধান বান্দা পূর্ণ করবে। আর আল্লাহ তাআলার নিষেধাজ্ঞার ওপর ঈমান রেখে, আল্লাহর শাস্তির প্রতি ভয় রেখে, তাঁর নিষেধকৃত বিষয়গুলো বান্দা পরিত্যাগ করবে।

ত্বলক ইবনু হাবীব বলেন, 'ফিতনাকে তাকওয়ার মাধ্যমে প্রতিহত করবে।' লোকেরা বলল, 'তাকওয়া কী?' তিনি বললেন, 'আল্লাহ-প্রদত্ত নূরের (জ্ঞান) আলোকে, আল্লাহর কাছ থেকে প্রতিদানের আশায়, তাঁর মর্জিমাফিক আমল করা। এবং আল্লাহর দেওয়া নূরের মাধ্যমে, আল্লাহর শাস্তিকে ভয় করে, তাঁর অবাধ্যতা পরিত্যাগ করা।'[৬]

তাকওয়ার সংজ্ঞায় এরচেয়ে উত্তম কথা আর নেই। আসলে প্রত্যেক কাজেরই একটা ভিত্তি থাকে এবং তা সম্পাদনের দ্বারা কোনো না কোনো লক্ষ্য থাকে। আমল দ্বারা আল্লাহর আনুগত্য বা নৈকট্য লাভের শর্ত হলো, এর ভিত্তি ঈমানের ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। বান্দা কাজটি করবে কেবলমাত্র ঈমানের দাবিতে। না অভ্যাসের কারণে হবে, না মনের চাহিদা বা যশখ্যাতি অর্জনের জন্য হবে। অবশ্যই তা হতে হবে নিরেট ঈমানের দাবিতে। আর আমলের একমাত্র লক্ষ্য থাকবে আল্লাহর প্রতিদান এবং তাঁর সন্তুষ্টি লাভের আশা; যাকে 'ইহতিসাব' বলা হয়। এজন্য এই মৌলিক বিষয় দুটিকে অনেক জায়গায় একত্রে আনা হয়েছে। নবি ﷺ বলেছেন,

مَنْ قَامَ لَيْلَةَ القَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا

'যে ব্যক্তি ঈমান ও ইহতিসাবের সাথে রমাদানের সাওম পালন করে।'...

[৬] আয যুহদু লিইবনিল মুবারক, পৃষ্ঠা নং : ৪৭৩; হিলইয়াতুল আউলিয়া : ৩/৬৪; আয যুহদু লিলবায়হাকী : ৯৬৩

‘যে ব্যক্তি ঈমান ও ইহতিসাবের সাথে লাইলাতুল কদরে রাত্রি জাগরণ করে।’[৭]

এ ধরনের আরও অনেক উদাহরণ পাওয়া যাবে।

ত্বলক ইবনু হাবীবের কথার দ্বারা প্রথমে ঈমানের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে; যা সমস্ত আমলের উৎস এবং উদ্দীপক। এরপর হাদীসে বর্ণিত দ্বিতীয় নীতির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ ইহতিসাব তথা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে প্রতিদান লাভের আশা। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখেই বান্দা আমল করবে।

এই হচ্ছে তাকওয়ার পরিচয়। ঈমানের সকল মৌলিক ও শাখাগত বিষয়ের সমষ্টিই হলো তাকওয়া। নেক কাজও এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।

উল্লিখিত আয়াতে একসাথে বলা হয়েছে—**“তোমরা নেক কাজ ও তাকওয়ার ক্ষেত্রে পরস্পরকে সহযোগিতা করো।”** এক্ষেত্রে ‘নেক কাজ’ এবং ‘তাকওয়া’ উভয়ের মধ্যে পার্থক্য দেখানো যেতে পারে। একটি হচ্ছে লক্ষ্য অর্জনের উপকরণ, আর অন্যটি কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য। সত্তাগতভাবেই নেক কাজ হচ্ছে কাঙ্ক্ষিত বিষয়। কারণ এটা বান্দার পূর্ণতা এবং তার ন্যায়পরায়ণতার পরিচায়ক। যেমনটা ইতিপূর্বে বলা হয়েছে। অপরদিকে তাকওয়া হলো নেক কাজের পথপ্রদর্শক এবং মাধ্যম। তাকওয়া শব্দটি এদিকেই ইঙ্গিত করে। তাকওয়া শব্দটির মূল হচ্ছে وَقْوَى আর اَلْوِقَايَةُ শব্দের অর্থ প্রতিরক্ষা। সুতরাং ‘তাকওয়া’ শব্দের অর্থ দাঁড়ায় প্রতিরক্ষা গ্রহণ করা। কারণ, মুত্তাকি ব্যক্তি তার ও জাহান্নামের আগুনের মাঝে প্রতিরক্ষা তৈরি করে। এর মাধ্যমেই সে কাঙ্ক্ষিত নেকির পথে অগ্রসর হয়। তাই, তাকওয়া ও নেকির সম্পর্ক হলো সুস্থতা ও পথ্যের মতো।

কুরআন কারীমের শব্দাবলি ও এর মর্ম বোঝা এবং নবি ﷺ-এর ওপর আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তার সীমারেখা সম্পর্কে ধারণা লাভ করা, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ, এটা উপকারী জ্ঞান। এই জ্ঞান যার নেই, আল্লাহ তাআলা তার সমালোচনা করেছেন। এ বিষয়ে যথাযথ জ্ঞান না থাকার কারণে বড় ধরনের দুটি সমস্যার সৃষ্টি হয়ে থাকে।

প্রথমত, কোনো শব্দের মর্মার্থের মধ্যে এমন বিষয় ঢুকে পড়ে, যার সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই। এরপর সেটাকেই প্রকৃত হাকিকত বলে চালিয়ে দেওয়া হয়।

[৭] এই হাদীসের অংশ দুটি সহীহ বুখারি, হাদীস নং : ১৯০১ এবং সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ৭৬০ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে

ফলে আল্লাহ তাআলা যে-দুটি বিষয়ের মাঝে তফাত করেছেন, (এইসব গলদ ব্যাখ্যার দ্বারা) তা একাকার হয়ে যায়।

দ্বিতীয়ত, শব্দের কিছু মর্মার্থ ছুটে যায় এবং সেগুলোর মধ্যে তার হুকুম আর বাকি থাকে না। ফলে আল্লাহ তাআলা যে-দুটি বিষয়কে একত্র করেছেন, তা আলাদা হয়ে পড়ে।

বিচক্ষণ ব্যক্তি এই উদাহরণ বুঝতে পারেন। ফলে তিনি দেখতে পান যে, সিংহভাগ মতপার্থক্যের উৎপত্তি এখান থেকেই হয়ে থাকে। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করতে গেলে বিশাল বইও যথেষ্ট হবে না। উদাহরণস্বরূপ 'খামর' শব্দটির কথা বলা যায়। এটি সকল নেশা উদ্রেককারী বস্তুকে শামিল করে। কোনো একটি নেশাদার বস্তুকে এর থেকে আলাদা করে, খামরের হুকুম উঠিয়ে দেওয়া বৈধ হবে না। একইভাবে 'মাইসির' তথা জুয়া শব্দ। এখান থেকে জুয়ার কিছু প্রকারকে আলাদা করা যাবে না। 'নিকাহ' শব্দের ক্ষেত্রেও একই কথা। নিকাহ'র আওতায় পড়ে না, এমন কিছুকে এর অন্তর্ভুক্ত করা ঠিক নয়। একইভাবে 'রিবা' শব্দটি। সুদের কিছু প্রকারকে এর থেকে বের করে দেওয়া এবং সুদ নয় এমন কিছুকে এই শব্দের অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না। 'যুলুম-ইনসাফ', 'মারূফ-মুনকার' ইত্যাদি অসংখ্য শব্দ রয়েছে, যেখানে শব্দের মর্মার্থ সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে না পারলে, কুরআন কারীম বোঝার ক্ষেত্রে বড় ধরনের ভ্রান্তি হতে পারে।

মোটকথা মানুষ হিসেবে আমাদের সকলেরই সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এই জন্যই আমরা সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস করি। পরস্পর মেলামেশা, ওঠাবসা করি। পরস্পরের একত্রিত হওয়া ও মেলামেশার উদ্দেশ্যই হলো নেক কাজ ও তাকওয়ার ক্ষেত্রে একে অন্যকে সহযোগিতা করা। এক্ষেত্রে প্রত্যেকেই তার সতীর্থকে সহায়তা করবে। হোক তা জ্ঞানগতভাবে কিংবা কাজের মাধ্যমে। আল্লাহ তাআলা মানবজাতিকে জ্ঞান-গরিমা ও শক্তি-সামর্থ্যে অস্বয়ংসম্পূর্ণ করে সৃষ্টি করেছেন। এর পেছনে হিকমাতও রয়েছে। এর ফলে তারা একে অন্যের পরিপূরক হিসেবে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক বজায় রাখে। এটাই বাস্তবতা। আর এই সহযোগিতা যদি নেক কাজ ও তাকওয়ার ব্যাপারে না হয়, তবে স্বাভাবিকভাবেই বিপরীতটা ঘটবে। যে ব্যাপারে আয়াতের পরবর্তী অংশে বলা হচ্ছে—**'তোমরা পাপাচার ও সীমালঙ্ঘনের কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা কোরো না।'**

'নেক কাজ ও তাকওয়া' যেমনিভাবে আবশ্যিকভাবে পালনীয়, তেমনিভাবে

'পাপাচার ও সীমালঙ্ঘন'-ও বর্জনীয়। পাপাচার ও সীমালঙ্ঘনের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। পাপাচার সত্তাগতভাবেই হারাম। আর সীমালঙ্ঘন হলো—বৈধ বিষয় মাত্রা ছাড়িয়ে হারামের রূপ নেওয়া।

এজন্য যিনা, মদ, চুরি প্রভৃতি হলো পাপাচার। আর চারজন স্ত্রী বিদ্যমান থাকতে পঞ্চম কাউকে বিয়ে করা, পাওনাদারের কাছ থেকে পাওনার চেয়েও বেশি অর্থ আদায় করা প্রভৃতি হলো সীমালঙ্ঘন। এটা আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা অতিক্রম করার শামিল। এ ব্যাপারে ইরশাদ করা হয়েছে,

تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

'এটা আল্লাহর সীমারেখা। কাজেই একে অতিক্রম কোরো না। আর যারা আল্লাহর সীমারেখা লঙ্ঘন করে, তারা যালিম।'[৮]

আরেক জায়গায় আল্লাহ তাআলা বলছেন,

تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ۗ

'এটা আল্লাহর সীমারেখা। এর নিকটবর্তী হয়ো না।'[৯]

এক আয়াতে তিনি সীমারেখা অতিক্রম করতে নিষেধ করেছেন। আরেক আয়াতে কাছে যেতেও মানা করেছেন। কেন? কারণ বস্তুর শেষসীমা কখনও বস্তুর অধীনস্থ থাকে, আবার কখনও থাকে না। বরং সীমানা থেকেই তার বিপরীত বিষয় শুরু হয়ে যায়। প্রথম দৃষ্টিকোণ থেকে আল্লাহ তাআলার সীমারেখা অতিক্রম না করতে বলা হয়েছে। আর দ্বিতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে নিকটবর্তী হতেও নিষেধ করা হয়েছে।

আমরা শুরুতেই বলেছি, সূরা আল মায়িদার ওই আয়াতটিতে দুটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

১. নিজেদের মধ্যকার সম্পর্ক এবং এই সংশ্লিষ্ট দায়িত্ব।

২. নিজেদের ও আল্লাহর মধ্যকার সম্পর্ক এবং এই বিষয়ক কর্তব্য। (আয়াতটি আমরা আবার উল্লেখ করছি) :

وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٢﴾

[৮] সূরা বাকারাহ, ২ : ২২৯

[৯] সূরা বাকারাহ, ২ : ১৮৭

> ‘নেক কাজ ও তাকওয়ার কাজে তোমরা একে অপরকে সহযোগিতা করো; পাপাচার ও সীমালঙ্ঘনের কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা কোরো না। আর তাকওয়া অবলম্বন করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ শাস্তি প্রদানে অত্যন্ত কঠোর।’[১০]

এতক্ষণ প্রথম পয়েন্ট নিয়ে কথা হলো। এবার বান্দা ও তার রবের মধ্যকার সম্পর্কের কথায় আসা যাক। এ ক্ষেত্রে বান্দার দায়িত্ব কী? এ ব্যাপারে তার করণীয় কী? বান্দা তার রবের আনুগত্যের পথে আগে বাড়বে এবং তাঁর অবাধ্যতা থেকে বিরত থাকবে। আল্লাহ তাআলা এটাই দুই শব্দে বলে দিয়েছেন— وَاتَّقُوا اللهَ (তাকওয়া অবলম্বন করো)।

আলোচ্য আয়াতে বান্দাদের পারস্পরিক কর্তব্য এবং রবের প্রতি তাদের কর্তব্য— এই দুটি দিক নিয়ে আলোচনা করা হলো।

প্রথম কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করতে চাইলে, নিজের বড়ত্বের সিংহাসনকে ভেঙে ফেলতে হবে। নেক কাজ ও তাকওয়ার বিষয়ে পারস্পরিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে নিজের সুনাম, খ্যাতি বা যশের চিন্তা একদম ঝেড়ে ফেলতে হবে মাথা থেকে। এই সহযোগিতা হবে নিছক আল্লাহর আদেশ পালনার্থে। একজন মুসলিম হিসেবে অপর ভাইয়ের প্রতি ইহসানের জায়গা থেকে। দ্বিতীয় কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করতে চাইলে, আল্লাহ ও বান্দার মাঝ থেকে মাখলুককে বের করে দিতে হবে। ঐশী ভালোবাসার চাদরে ঢাকা বান্দার এই একনিষ্ঠ দাসত্বের তাঁবুতে এক আল্লাহ ছাড়া আর কেউ থাকতে পারবে না।

এই কর্তব্য দুটি পালন করতে গিয়ে বান্দার ত্রুটিবিচ্যুতি হয় মূলত এ সূক্ষ্ম পয়েন্টে মনোযোগ না দেওয়ার কারণে। অতএব এই পয়েন্টটি গভীরভাবে আত্মস্থ করার কোনো বিকল্প নেই। শাইখ আবদুল কাদির ﵀ একই কথা বলেছেন। তিনি বলেন, ‘স্রষ্টার সান্নিধ্যে পুরো সৃষ্টি থেকে পৃথক হয়ে যাও। আর সৃষ্টির সেবায় ভুলে যাও নিজের (বড়ত্ব)-কে। এটা যে পারবে না, সে বিপথে চলতে থাকবে। তার কার্যক্রম আর সঠিক জায়গায় স্থির থাকবে না।’[১১]

---

[১০] সূরা মায়িদাহ, ৫ : ২

[১১] আল কাওয়াকিবুস সারাহ : ৩/১১৫

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে হিজরত

এক মুসাফির সফরের কাফেলা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। সফরের এই পথকেই সে তখন বাসস্থান বানিয়ে নিল। ফলে জন্মভূমির পরিচিত মুখ আর সুযোগ-সুবিধার মাঝে এক আড়াল সৃষ্টি হলো। মুসাফির পেয়ে বসল এক নির্জন পরিবেশ। ঠিক সেই সময়টাতে তার ভেতর চিন্তার এক নতুন তরঙ্গ সৃষ্টি হলো। সে তার মনোযোগ এক মহান বিষয়ের প্রতি নিবিষ্ট করল। এর মাধ্যমে আল্লাহর প্রতি গন্তব্যের প্রতিটি মানযিল খুব সহজেই অতিক্রম করা এবং বাকি জীবনটা এ পথেই কাটিয়ে দেওয়া তার জন্য সহজ হবে। এরপর সুপথ প্রদর্শনের একমাত্র মালিক আল্লাহ তাআলা তাকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের পথ দেখালেন। সেটি হচ্ছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে হিজরত। এই হিজরত সর্বাবস্থায় সকলের ওপর ফরযে আইন। এই ফরযিয়্যাতের আবশ্যকতা কখনও কারও ওপর থেকে রহিত হয় না। বান্দার কাছে আল্লাহর চূড়ান্ত কাম্য বিষয় এই হিজরত।

হিজরতের প্রকারভেদ

হিজরত দুই ধরনের।

১. সশরীরে এক দেশ থেকে আরেক দেশে হিজরত। শারীয়াতে এই হিজরতের নির্ধারিত বিধিবিধান রয়েছে। আমাদের আলোচনা এই প্রকারের হিজরত নিয়ে নয়।

২. আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে হিজরত করা। সশরীরে নয়, শর্তহীন দাসত্ব, আত্মসমর্পণ ও ইখলাসের মাধ্যমে। অনুসরণ, অনুকরণ ও একমাত্র আদর্শ হিসেবে সুন্নাহকে গ্রহণ করে রাসূলের দিকে হিজরত। আমাদের আলোচনার বিষয় এটিই। এটাই আসল ও প্রকৃত হিজরত। শারীরিক হিজরত মূলত এই হিজরতেরই অনুগামী।

আল্লাহর দিকে হিজরত

হিজরত মানে এক জায়গা ছেড়ে আরেক জায়গার দিকে চলে যাওয়া। প্রত্যেক হিজরতের একটা শুরু ও শেষ থাকে। অর্থাৎ বান্দা অন্তরের মাধ্যমে গাইরুল্লাহর ভালোবাসা থেকে আল্লাহ তাআলার ভালোবাসার দিকে হিজরত করবে। গাইরুল্লাহর দাসত্ব থেকে হিজরত করবে আল্লাহর দাসত্বের দিকে। গাইরুল্লাহকে ভয় না করে আল্লাহকে ভয় করবে। গাইরুল্লাহর কাছে প্রত্যাশা করা বাদ দিয়ে প্রত্যাশা করবে আল্লাহ তাআলার কাছে। গাইরুল্লাহর ওপর ভরসা ছেড়ে দিয়ে, আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করবে। গাইরুল্লাহকে বাদ দিয়ে এক আল্লাহকে ডাকবে, গাইরুল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়ার পরিবর্তে আল্লাহর কাছে চাইবে এবং গাইরুল্লাহর আনুগত্য থেকে বের হয়ে আল্লাহ তাআলার আনুগত্যের দিকে হিজরত করবে। এটাকেই বলে আল্লাহর পানে ধাবিত হওয়া। আল্লাহ তাআলা বলেন,

فَفِرُّوٓاْ إِلَى ٱللَّهِۖ

'অতএব, তোমরা আল্লাহর দিকে ধাবিত হও।'[১২]

তাওহীদের দাবিও এটিই। বান্দা আল্লাহর কাছ থেকে পলায়ন করে তাঁর দিকেই ছুটে আসবে।

এই পলায়ন করা ও ছুটে আসার মধ্যে তাওহীদের এক গূঢ় রহস্য রয়েছে।

বান্দা তার আনুগত্য-আত্মসমর্পণ, ভয়-প্রত্যাশা, কামনা-যাচনা একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্যই সংরক্ষিত রাখবে। শাস্ত্রীয় ভাষায় একে তাওহীদুল উলূহিয়্যাহ বলা হয়। অর্থাৎ ইবাদাত ও ইবাদাতের আনুষঙ্গিক বিষয়গুলো একমাত্র আল্লাহর জন্য। সব নবির দাওয়াতের মূল বিষয়বস্তু এটিই ছিল। এটাই হলো আল্লাহ তাআলার 'দিকে' ছুটে আসার রহস্য। তাহলে আল্লাহ তাআলা থেকে পলায়নের ব্যাপারটা কী হবে?

এখানেও আল্লাহ তাআলার তাওহীদের এক গূঢ় রহস্য লুকিয়ে আছে। একটু ভেঙে বলছি। দেখুন, দুনিয়ার যত দুঃখ-বিপর্যয় থেকে বান্দা দূরে থাকতে চায়, অপছন্দ করে, পলায়ন করতে চায়, তা একমাত্র আল্লাহর ইচ্ছাতেই হয়ে থাকে। ইতিপূর্বে আমরা যেসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করলাম, যেগুলো থেকে ফিরে এসে বান্দাকে আল্লাহর দিকে ধাবিত হতে হবে, সেগুলোও আল্লাহরই ক্ষমতাধীন। কারণ, আল্লাহ

[১২] সূরা যারিয়াত, ৫১ : ৫০